Pet by Dibyendu Palit

For More Books & Muzic Visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.MurchOna.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com

পেট

দিব্যেন্দু পালিত

প্রথম সন্দেহ করেছিল শর্মিষ্ঠা।

দুপুর আড়াইটে থেকে পৌনে তিনটের মধ্যে ব্রীজের ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে দেখা যায় রন্টুদের স্কুলের নীল বাসটাকে। তার আগেই ন'বছরের ছেলেকে বাড়িতে আনার জন্যে পেট্রল পাম্পের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে হয় তাকে। শর্মিষ্ঠা একাই যায় না। এই বিল্ডিংয়ের রমা দত্তের মেয়ে চন্দ্রলেখা এবং অঞ্জনা ব্যানার্জির ছেলে বিক্রমও পড়ে একই স্কুলে, ফেরে একই বাসে, একই সময়ে। রমাও যায়; অঞ্জনা কোনো কোনো দিন নিজে অপেক্ষা করে, কোনো দিন পাঠায় বাড়ির ঝি মঙ্গলাকে। তিনটি বালক বালিকাকে নিয়ে এক সঙ্গে একই লিফটে উঠে ঢুকে পড়ে যে যার ফ্ল্যাটে। ছেলেকে আনতে যাবার আগে শর্মিষ্ঠা নিজে খাওয়া সারে, কাজের মেয়ে নয়নতারাকে স্নানে পাঠায়, নয়ন ফিরে এসে খেতে বসতে বসতে আধ ঘণ্টাখানেক বিছানায় গড়িয়ে নেয় সে। তারপর তার বেরুবার সময়।

নয়ন খেয়েদেয়ে আড্ডা দিতে যায় নীচে। অনেক দিনই রন্টুকে নিয়ে ফেরার সময় শর্মিষ্ঠা লক্ষ্য করে লিফটের লাগোয়া ওপরে ওঠার সিঁড়ির পাশের চওড়া জায়গাটায় বসে জটলা করছে এর ওর ফ্ল্যাটের নানা বয়সের ঝি'রা। এ বাড়িতে চাকরের সংখ্যা কম। মাঝে মধ্যে তাদেরও কাউকে কাউকে মিশতে দ্যাখে ওই জটলায়।

বছর পাঁচেক আগে পরাগ ও ছেলের সঙ্গে বহুতল বাড়িতে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর থেকে শর্মিষ্ঠার মগজে যে সব দুশ্চিন্তা ঢুকেছে তার একটা এই ঝি-চাকরদের জটলা। কেন বা কী জন্যে ঠিক জানে না, তবে, তার সন্দেহ, এদের গালগল্পের বিষয় এ বাড়ির চৌষট্টিটি ফ্ল্যাটের যে কেউ। এবং সে ও পরাগও যেহেতু এই যে-কেউদের মধ্যে পড়ে, সুতরাং কোনো না কোনো ব্যাপারে তাদেরও বাদ পড়ার কথা নয়। সন্দেহ থেকেই এসে গেছে সতর্কতা।

নতুন ফ্ল্যাটে আসার বছর খানেকের মধ্যে এ বাড়িতে তাদের প্রথম ঝি লক্ষ্মী

হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবুর নাকি চাকরি গেছে, বউদি?'

প্রশ্নটা চমকে দেয় তাকে। চাকরি না গেলেও সেটা এমনই একটা সময় যখন অফিসে হয়রান হচ্ছিল পরাগ। কে বলেছে, জিজ্ঞেস করায় লক্ষ্মী বলল, 'কে বলেছে তা কি মনে আছে ঠিক! নীচে ওরা বলাবলি করছিল।'

পরে অনেক গবেষণার পর স্বামী-স্ত্রী ধারণা করে ছ'তলার ডলি বোসের ভাই কাজ করে পরাগের অফিসে, মাঝে মধ্যে আসে এই বিল্ডিংয়ে, সম্ভবত ওই ফ্ল্যাটের কোনো আলোচনা থেকেই ওদের ঝিয়ের মুখে রটনা হয়েছে কথাটা। সেই থেকে বেশ কিছুদিন লিফটে ওঠার সময় কারুর সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর থাকত শর্মিষ্ঠা, একটা হীনমন্যতার বোধ সারাক্ষণ কুরে খেত তাকে।

এ বাড়ির চৌষট্টিটি ফ্ল্যাটের তেষট্টিটিতে ঘটনাটা রটনা হবার আগেই অবশ্য নতুন চাকরিতে জয়েন করে পরাগ এবং হাওয়া পাল্টানোর চেষ্টায় এক কারণহীন জৈষ্ঠ্য মাসে লক্ষ্মীকে একটা নতুন শাড়ি কিনে দিয়ে শর্মিষ্ঠা বলে, 'নতুন অফিসে ডবল মাইনের চাকরি নিয়েছে বাবু। তুমি তো বাড়িরই লোক, তোমাকে এটা দিলাম।'

আন্দাজে ছোঁড়া ঢিল, তবু জায়গা মতোই পড়ে। দিন দুয়েক পরে লিফটের সামনে তাকে একলা পেয়ে সাত তলার রত্না কর বলল, 'কর্তার বিরাট উন্নতি হয়েছে শুনলাম! গাড়িও দিচ্ছে নাকি!'

শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারে এটা শাড়ি ঘুষ দেবার ফল, ডবল মাইনের সঙ্গে গাড়ি পাবার সম্ভাবনাও জুড়ে দিয়েছে লক্ষ্মী। বাস্তব তা নয়। পরাগের নতুন চাকরিটা আগেরটারই মতো। মাইনের অঙ্কটা কেউ ধরতে পারবে না; কিন্তু গাড়ি দেখা যায়, বানিয়ে বললে ধরা পড়ে যাবে। তখন হাওয়াটা আবার উল্টে যেতে পারে। সুতরাং জবাব না দিয়ে হ্যাঁ-না হেসে এড়িয়ে যায় সে।

পরের চার বছর অনেক ফ্ল্যাটের খবর এসে পৌঁছেছে তাদেরও কানে। এর মধ্যে বিখ্যাত ঘটনাটি দোতলার রেখা মণ্ডলের স্বামী বেরিয়ে যাবার পর দুপুরে ওদের ফ্ল্যাটে কোনো অপরিচিত পুরুষের যাতায়াতজনিত। খবরটা কমলাই এনেছিল। গুজব পাঁচ কানে পাকা হতে না হতেই এক দিন খবর পৌঁছয়—স্বামীকে ছেড়ে আর কারুর সঙ্গে ভেগে গেছে রেখা।

লক্ষ্মীকে নিয়ে গত চার বছরে তাদের ফ্ল্যাটে ঝি বদল হয়েছে চারবার। লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, কমলা এবং কমলা দেশে চলে যাবার পর এই মেয়েটি, নয়নতারা। মাস পাঁচেক আগে কমলাই জুটিয়ে দিয়েছিল। বয়স আঠারো কি কুড়ি, শক্তপোক্ত চেহারা, কাজেও চটপটে। তাদের ফ্ল্যাটে ছাড়াও সকালের দিকে কাজ করে পাঁচতলার অম্বুজ দাশগুপ্ত এবং সাততলার পবিত্র ব্যানার্জির ফ্ল্যাটে। বেলা ন'টা থেকে সন্ধে পর্যন্ত নয়নতারা শর্মিষ্ঠাদের জন্যে। রান্না করে, সুতরাং খায়ও এক বেলা। সন্ধের পর

চলে যায় বস্তিতে। দুপুরে ছেলেকে নিয়ে ফেরার সময় শর্মিষ্ঠা প্রায়ই দ্যাখে নীচের আড্ডায় চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে অন্যদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে নয়নও।

আজ দেখল না।

রন্টুকে নিয়ে ওপরে উঠে এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই সে শুনল বাথরুমে কেউ ওয়াক্ তুলছে সশব্দে।

দরজাটা আধ-ভেজানো। কাছে গিয়ে বাথরুমের বাইরে থেকেই শর্মিষ্ঠা দেখল, বুকে হাত চাপা দিয়ে মাথাটা বেসিনের ওপর ঝুঁকিয়ে রেখেছে নয়ন। ইতিমধ্যে সে যে ফিরে এসেছে এবং দেখছে তা খেয়াল করেনি এখনো। ওকে আবার ওয়াক্ তুলে বেসিন ভরাতে দেখে গা গুলিয়ে উঠল নিজেরও।

রন্টুকে ঘরের ভিতর টেনে এনে ওর স্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল শর্মিষ্ঠা। ক্রমশ শুনতে পেল সজোরে জল নির্গত হচ্ছে বেসিনের ট্যাপ থেকে।

কিছু বলতে হলে এখনই বলতে হয়। ঘৃণা ও বিরক্তি এতক্ষণে পরিণত হয়েছে রাগে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এসে শর্মিষ্ঠা বলল, 'কী ব্যাপার! বমি করছ!'

'বমি পেলে কি করব!' বেসিন পরিষ্কার করে বেরিয়ে এসে নয়ন তখন আঁচল বুলিয়ে জল মুছছে মুখ, গলা, ঘাড়ের। ধরা পড়ে যাবে ভাবেনি। কয়েক সেকেণ্ড শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'খেয়ে উঠে কেমন গা গুলিয়ে উঠল।'

'নীচে গেলেই পারতে? এখানে কেন!'

'নীচে যেতে যেতে ঘর ভাসত। বমি চেপে রাখা যায় নাকি!'

বিল্ডিংয়ের ঝি চাকরদের জন্য আলাদা বাথরুম আছে নীচে। সেখানে যেতে হলে আগে পেরোতে হত ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত দূরত্ব। তার আগেই ছিত্‌রে যেতে পারত। বিরক্ত হলেও শর্মিষ্ঠা ভাবল, ঘরদোর নোংরা করার চেয়ে বেসিন নোংরা করাই ভাল। ফ্ল্যাটের দরজার পরেও আছে তিনতলা থেকে নীচে নামার সিঁড়ি। কম করেও কুড়ি একুশ ধাপ। সিঁড়িতে কিছু হলে পাঁচকান হত। এমনও হতে পারে, কেউ দেখে ফেললে বিল্ডিং কোঅপারেটিভ সোসাইটির অফিস থেকে চিঠি পেত পরাগ। চেয়ারম্যান প্রফুল্ল মিত্তির বেয়াড়া লোক, যে-কোনো ছুতোয় ওয়ার্নিং দেয় মেম্বারদের। তিন চার মাস আগে তাদের ফ্লোরের দেয়ালে কেউ পানের পিক ফেলায় চিঠি পাঠায় চারটি ফ্ল্যাটেই। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল এটা চার ফ্ল্যাটের কারোরই কাজ হতে পারে না। অন্য কেউ ফেলে গেছে। তবে এ নিয়ে চার ফ্ল্যাট থেকেই পাল্টা জবাব দিতে হয়।

আপাতত খুব খুঁটিয়ে নয়নকে দেখতে দেখতে শর্মিষ্ঠা বলল, 'আগের দিনও কি তুমিই বমি করেছিলে?'

'ও মা! না তো! রোজই কি বমি হয় নাকি!'

'তা জানি না। পরশু বিকেলে বেসিনে ভাতের দানা, পুঁই শাকের টুকরো, লঙ্কার খোসা দেখেছি। বাবু, রন্টু কেউই পুঁইশাক খায় না। তাহলে আমিই করেছি, না কি!'

নয়নের জবাবের অপেক্ষা না করে পায়ের ঠেলায় বাথরুমের দরজাটা খুলে দূর থেকেই বেসিনে চোখ বুলিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, 'ইস! এখনো নোংরা আছে। পরিষ্কার করো ভাল করে। ফেনাইল ঢালো। দুর্গন্ধে টেঁকা যাচ্ছে না!'

ঘরে এসে শর্মিষ্ঠা টের পেল নির্দেশ পালন করছে নয়ন। ঝাঁটার শব্দে শপশপ করছে ফেনাইলের গন্ধ। রাগ এবং ঝাঁঝও। লক্ষ্য শর্মিষ্ঠাই। মিনিট কয়েক পরে সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল নয়ন।

মেয়েটি চলে যাবার পর রন্টুকে খাবার বেড়ে দিয়ে শর্মিষ্ঠা ভাবল, এর বেশি কিছু বলা সঙ্গত হত না। কাজ ছেড়ে দিলে মুশকিলে পড়বে সে নিজেই। বিল্ডিংয়ের ঝি চাকররা সব এককাট্টা। গত মাসে ছ'তলার চৌধুরীরা কী এক কারণে তাদের কাজের ছেলেটিকে বিদায় করার পর আর কেউই কাজ নিচ্ছে না ওখানে। বরং এর পর থেকে সে ওয়াচ করবে মেয়েটিকে।

বিকেলে চায়ের সময় নয়ন ফিরে এলে নরম গলায় শর্মিষ্ঠা বলল, 'দুপুরে বমি করলে। এখন চা না খেয়ে বরং এক গ্লাস লেবুজল খাও। অম্বল হলে কেটে যাবে। শরীর খারাপ লাগলে আগে থেকেই বলবে—'

এসব বলতে বলতে এবং তার পরে লক্ষ্য করল, গোঁজ ভাবটা কেটে যাচ্ছে মেয়েটার। একটু চুপচাপ থাকলেও কথাবার্তার জবাবও দিয়ে যাচ্ছে ঠিকঠাক।

সন্ধেয় নয়ন ফিরে যাবার পর পরাগের কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করে শর্মিষ্ঠা বলল, 'ক'দিন দেখছি চোখের কোলে কালিও পড়েছে। আগের দিনও বমি করেছিল—'

'কী আর করা যাবে!' পরাগ বলল, 'তাহলে তো বাথরুম পাহারা দেবার জন্যেও একটা লোক রাখতে হয়।'

'সে-কথা বলছি না।'

'তবে?'

সন্দেহের কথাটা খোলাখুলি বলবে কিনা ভাবতে ভাবতে স্বামীকে লক্ষ্য করল শর্মিষ্ঠা। তারপর বলেই ফেলল।

'এগুলো প্রেগন্যান্সির লক্ষণ—'

'প্রেগন্যান্সি!' পরাগ নড়েচড়ে বসল, 'আনম্যারেড মেয়ে। প্রেগন্যান্ট হবে কী করে!'

'হয় না!'

শর্মিষ্ঠার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাল না পরাগ। খানিক পরে বলল, 'তাহলে তো কেলেঙ্কারি!'

'সেটাই বোঝো।'

'আর ইউ সিওর?'

প্রশ্নটা থামিয়ে দিল শর্মিষ্ঠাকে। সন্দেহ করা এবং নিশ্চিত হওয়া এক ব্যাপার নয়। পরাগ ঝট করে সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত; 'সিওর' বললে এখনই কিছু করার কথা ভাবতে পারে। যদি ছাড়িয়ে দেয়?

হঠাৎ সংশয়ের ছায়া ছড়াল শর্মিষ্ঠার মুখে। এড়িয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'বাচ্চা তো আমারও হয়েছে—'

ব্যাপারটা তখনকার মতো ধামাচাপা পড়লেও পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে কেমন থম মেরে গেল স্বামী স্ত্রী দুজনেই। অনেক দিন আগে পরাগের চাকরি যাবার ঘটনায় যেমন হয়েছিল।

পরের দিন দেরি করে অফিসে গেল পরাগ। তার আগে নয়নের কাজে আসা এবং শর্মিষ্ঠাকে স্নান করার জন্যে বাথরুমে ঢোকার সুযোগ দিল। এসব পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে মাথার দরকার হয়। হিসেব্ করে পাল্টে নিতে হয় কণ্ঠস্বর। সুতরাং, সুযোগ বুঝে, গলায় যথোচিত দরদ মিশিয়ে সে নয়নকে বসার ঘরে ডাকল এবং দৃষ্টিতে লক্ষ্য ঠিক রেখে খুব কাছ থেকে ওকে তদন্ত করতে করতে বলল, 'একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। দিবি নাকি?'

মেয়েটির স্বাস্থ্য ভাল, চটক আছে, মুখচোখও ঢলঢলে। আরও ঘষামাজা করলেই বস্তির মেয়ে বলে চেনা যাবে না। শর্মিষ্ঠার বর্ণনার সঙ্গে যথাযথ হয়ে ছায়া পড়েছে চোখের কোলে। কিন্তু এটা আগেও ছিল কিনা কী করে বোঝা যাবে?

ওকে দেখতে দেখতে পরাগ নিজেকেও দেখল। চুয়াল্লিশের চোখে আটত্রিশের শর্মিষ্ঠাকে ভাবলে শারীরিক পার্থক্য সামান্য হতাশাও ঘনিয়ে তোলে বুকে। তবে বস্তির মেয়ে বস্তিরই থাকবে। ইত্যাদি এবং দেখাটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে ভেবে সচেতন হয়ে বলল, 'ভাল করে বানাস—'

পরাগের দৃষ্টি লক্ষ্য করে এরই মধ্যে বুকের আঁচল টেনেছিল নয়ন। এর পর অজ্ঞাত কারণে হেসে বলল, 'বউদিও খাবে নাকি?'

'জিজ্ঞেস করে নে।'

খানিক পরে নয়ন চা দিতে এলে একই দৃষ্টিতে একই ভাবে ওকে খুঁড়তে খুঁড়তে পরাগ লক্ষ্য করল, একই ধরনের মোচকানো হাসি ফুটে আছে মেয়েটির মুখে। চাপা, কিন্তু ভিতর কাঁপানো। এখন তাকেও দেখছে স্পষ্ট চোখে। কিছু ভেবে নিল নাকি?

চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি চায়ে চুমুক দিল পরাগ এবং শুনল ছিটকিনি খুলছে বাথরুমের দরজার। তার মানে স্নান সেরে বেরিয়ে এসেছে শর্মিষ্ঠা। এখন তার হাতে চায়ের কাপ, সামনে দেয়াল। গত বছরে কলি ফেরানো বিস্কুট রঙে খোলতাই বেড়েছে যেন। দেয়ালে হুসেনের আঁকা টাটা কোম্পানির ক্যালেণ্ডার—আগুনে লোহায় হাতুড়ি পিটছে একজন সবল পুরুষ। পরাগের নিজেকে দুর্বল লাগল।

চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল পরাগ। নির্দিষ্ট ভাবনা নিয়ে বেডরুমে এসে ঢুকল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে শর্মিষ্ঠা। আয়নায় ওকে দেখতে দেখতে পরাগ জিজ্ঞেস করল, 'তলপেট, না কোমর, কোনটা আগে ভারী হয়?'

'কেন!'

'কোমর তো একই আছে মনে হচ্ছে। তবে তলপেটটা—'

শর্মিষ্ঠা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি দেখলে বুঝি! ছিঃ!'

'তাকিয়ে দেখতে দোষ কী!' অপ্রস্তুত গলায় পরাগ বলল, 'বুঝতে দিয়ে দেখিনি।'

পরাগের অস্বস্তি লক্ষ্য করে শর্মিষ্ঠা বুঝতে পারল কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। দোষটা তারই। সে না খোঁচালে এসব কথা উঠত না। এখন পরাগকে তিরস্কার করলে বাড়াবাড়ি হবে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সে বলল, 'নিজের বউকে লক্ষ্য করোনি?'

'দশ বছর হতে চলল, সব কি মনে থাকে নাকি! তাছাড়া তোমাকে সন্দেহ করারও কারণ ছিল না।'

'এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। কিছু হলে আমিই বুঝতে পারব।'

দিন চারেকের মধ্যে আবার একই ধরনের ঘটনা ঘটল। সকালে চা খেতে খেতে হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল নয়ন। ধরনটা সন্দেহজনক। একটিই ঘটনা যেহেতু আরও কোনো কোনো ঘটনা মনে পড়িয়ে দিতে পারে, সুতরাং শর্মিষ্ঠার মনে পড়ল, খানিক আগে বাসন ধুতে ধুতে বড় হাঁ করে হাই তুলেছিল নয়ন, তখন মনে হয় কাজে মন নেই, না করে উপায় নেই বলে করা, শরীর ছেয়ে যাচ্ছে ঘুমের মুদ্রায়। ইদানীং মেয়েটার অন্যমনস্কতা বেড়েছে। গতকাল বিকেলে খুচরো বাজারে পাঠিয়েছিল পরিষ্কার চারটে জিনিস আনতে বলে। চারটেই এনেছিল। কিন্তু লবঙ্গের পুরিয়া ভেবে যেটা খুলল তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গরমমশলা। ক্যান্সারের ভয়ে পরাগ আজকাল সিগারেট খাচ্ছে না, অভ্যাসজনিত অস্বস্তি কাটাতে যখন তখন লবঙ্গ ফেলে মুখে। গরমমশলার চারটে লবঙ্গ একবেলাও যাবে না। বিরক্ত হয়ে সে নিজেই ছুটেছিল লবঙ্গ কিনতে। এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার কারণ কী!

মিনিট পনেরো পরে নয়ন ফিরে আসার পর প্রখর হল শর্মিষ্ঠা।

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'নীচে।'

উত্তরটা স্পষ্ট ও নির্বিষ। অধিকারবোধ থেকে বলা। কথার ধরনে রাগ হলেও ওকে আর ঘাঁটাবার সাহস হল না শর্মিষ্ঠার। কিন্তু, সন্দেহ থেকে গেল।

সেদিনও সে ঘটনাটা বলল পরাগকে।

'ভাবছি ছাড়িয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না পরাগ। শর্মিষ্ঠার চিন্তার ছায়া ছড়িয়ে পড়ল তারও মুখে। পরে বলল, 'ছাড়াতে গেলে কারণ লাগে। শরীরটা ওর, পেটটাও। কিছু হয়ে থাকলে দায়িত্ব ওরই। তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ কেন!'

'এর চেয়ে বুড়িটুড়ি রাখলে ভাল হত!'

'কমলা ঝিমুত। শরীর খারাপের অজুহাতে প্রায়ই কামাই করত। এই মেয়েটাকে পেয়ে তুমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলে—'

'তখন কি জানতাম এরকম হতে পারে!'

পরাগ গম্ভীর হয়ে গেল।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ কমল না তাতে। বরং বেড়ে গেল আরও, যখন আরও কয়েকদিন পরে একদিন ন'টা বেজে গেল, দশটা বেজে গেল, কিন্তু কাজে এল না নয়ন। রন্টু এবং পরাগ দুজনেই বেরিয়ে গেছে স্কুলে, অফিসে। রাতের এবং সকালের এঁটো বাসনকোসন ডাঁই হয়ে পড়ে আছে রান্নাঘরে, ছাড়া জামাকাপড় কাচা হয়নি, ঘরদোর পরিষ্কার করা বাকি। এসব কি তাকেই করতে হবে নাকি!

সাতপাঁচ ভেবে নিজেই খবর নিতে বেরুল শর্মিষ্ঠা।

ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বিল্ডিংয়ে এসে প্রথমেই পাঁচতলার অম্বুজ দাশগুপ্তের ফ্ল্যাটে যায় নয়ন, ঘণ্টা দেড়েক পরে সাত তলায় পবিত্র ব্যানার্জির ফ্ল্যাটে। অম্বুজ দাশগুপ্তের স্ত্রী বন্দনার সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা আছে তার। ফোনটোন করার দরকার হলে সে কিংবা পরাগ যে দু তিনটি ফ্ল্যাটে যাবার কথা ভাবে, দাশগুপ্তদের ফ্ল্যাট তার একটি।

বন্দনাই দরজা খুলল।

'আ-রে! এস, ভেতরে এস।'

'নয়ন আসেনি?'

'না তো!' বন্দনা বলল, 'ওপরে খোঁজ নিয়েছিলাম, সেখানেও আসেনি। আমি তো নিজেই সেরে নিলাম সব।'

'আমাকেও তাই করতে হবে।'

বন্দনাকে নিশ্চিন্ত দেখে চলে যাবে ভেবেও ভেতরে ঢুকল শর্মিষ্ঠা। মাথাটা

ধরে আছে, বসতে বললে এক কাপ চা-ও নিশ্চয়ই খাওয়াবে। গত সপ্তাহে একদিন ওদের শাড়ির একজিবিশনে যাবার নেমন্তন্ন করতে এসে গল্প করে গিয়েছিল আধঘণ্টা। কফিও খেয়েছিল। সেদিন অবশ্য নয়ন ছিল। আড্ডা দিতে অসুবিধে হয়নি। এখন ফিরে গিয়ে ঝক্কি সামলাতে হবে ভেবে ফিরতেও ইচ্ছে করছে না। সুতরাং খানিকক্ষণ বসে যাবার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'তোমার তো মেয়ে আছে। কিছুটা সাহায্য করতে পারে।'

'হ্যাঁ ভাই, সেটা বলতে পার। আজ তনুই মাছ রাঁধল। একটু আগে কলেজে বেরিয়েছে।' বন্দনা বলল, 'চা খাবে তো?'

স্বস্তি লুকিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, 'তোমাকেই তো করতে হবে?'

'রাখো তো! আমার যেন রাঁধাবাড়ার দশটা লোক আছে! বোসো, জলটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

বন্দনার যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে শর্মিষ্ঠা ভেবে নিল, তার সমস্যা হলে বন্দনারও হবে। ওকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।

'মেয়েটা এল না কেন বলো তো?'

'এদের কামাই করার কারণ থাকে নাকি! কাল এসে একটা ছুতো দেখাবে। মা'র অসুখ কিংবা দিদি হাসপাতালে গেছে—'

'আমার ধারণা ওর নিজেরই কিছু হয়েছে।'

'কী হবে!'

'হতেও তো পারে। অসুখ-বিসুখ বা অন্য কিছু।'

'তোমাকে বলেছিল কিছু?'

'বললে তোমার কাছে খোঁজ নিতে আসব কেন!'

সেই সময়ে টেলিফোন বেজে ওঠায় উঠে গেল বন্দনা। ফিরে এল চা নিয়ে। তারপর সোজাসুজি শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে ওকে চায়ের কাপ থেকে মুখ তোলার সুযোগ দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য কিছু হয়েছে ভাবছ কেন?'

'এমনিই।' শর্মিষ্ঠা বলল, 'হতেও তো পারে—'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বন্দনা হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, 'কী সন্দেহ করছ বলো তো!'

শর্মিষ্ঠা নিজেকে আগলাতে পারল না। ঝুঁকি নিয়েই বলল, 'প্রায়ই তো দেখি বমি করে!'

'তুমিও দেখেছ?'

'কেন! তোমার এখানেও—'

'একদিন করেছিল। আমি দেখিনি, তনু দেখেছে। পিছনের ব্যালকনিতে কাপড়

মেলতে গিয়ে ঠোঙায় মুখ লুকিয়ে কিছু ওগরাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করতে বলল মুখে আমলকি ছিল। ঠোঙাটা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে নীচে।'

খুব মনোযোগ দিয়ে বন্দনাকে দেখছিল শর্মিষ্ঠা। দুজনেরই অভিজ্ঞতা এক হলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়; ভাবল, এর সঙ্গে পবিত্র ব্যানার্জিকে টানতে পারলে একজোট হয়ে ছাড়িয়েও দেওয়া যায়। তার আগে জানা দরকার ব্যাপারটা কী, সে যা ভাবছে বন্দনা তা-ই ভাবছে কি না।

ক'মুহূর্ত অপেক্ষা করে শর্মিষ্ঠা বলল, 'ওর মা-টা তো এদিকে আসে মাঝে মাঝে। ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয় না?'

'তুমি কি কিছু সন্দেহ করছ?'

শর্মিষ্ঠা তাকিয়ে থাকল। জবাব দিল না।

'একটা কথা বলতে পারি।' গলায় রহস্য টেনে বন্দনা বলল, 'প্রমিস করো কাউকে বলবে না!'

'বলোই না!'

'ওপরতলার মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে মেয়েটার কী সম্পর্ক বলো তো?'

'কেন!'

'নয়ন নাকি তোমার বাড়ির কাজ সেরে মাঝে মাঝেই ওঁর ফ্ল্যাটে যায়। সন্ধেবেলায়। তুমিও নিশ্চয়ই শুনেছ?'

'বাজে কথা!'

সোফায় পাশাপাশি বসে চা খাচ্ছিল দুজনে। শর্মিষ্ঠার গায়ে ঠেলা দিয়ে হি হি করা হাসিতে গড়িয়ে পড়ল বন্দনা।

'আপন গড বলছি। ওই ফ্লোরের কেয়াদি নিজে দেখেছে একদিন—।'

হাসি থামিয়ে বলল বন্দনা, 'দরজা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে আসছিল মেয়েটা। লোডশেডিং থাকায় কেয়াহি হেঁটেই উঠছিল, হঠাৎ দেখে ফেলে। মিস্টার ব্যানার্জিও নাকি দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিলেন—।'

'যাঃ! কী দেখতে কী দেখেছে! ফ্ল্যাটে ওঁর মা-ও থাকেন।'

'কোথায় মা! তিনি তো তিন মাস আগে চলে গেছেন ছোট ছেলের বাড়িতে। ছেলেটা শিবপুরে পড়ে, উইক এণ্ডে আসে। উনি তো একা।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল শর্মিষ্ঠার। পবিত্র ব্যানার্জি সম্পর্কে তার অবগত তথ্যের মধ্যে আছে বছর দুয়েক আগে, শীতকালে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বড়দিনের আগের দিন সন্ধেয়—সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা যায় ভদ্রলোকের স্ত্রী মনীষা। অনেকেই দেখতে গিয়েছিল বলে সেও গিয়েছিল। ফুলহাতা পুলওভার গায়ে থ হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন ভদ্রলোক। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছিলেন

মাঝে মাঝে। সে-বছরই শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছিল মনীষার ছেলে সম্বুদ্ধ; মনীষার বুকে মাথা ঠুকে আছড়ে পিছড়ে কাঁদছিল মা-মা করে। পাশের ফ্ল্যাটের কেয়াদিই তখন সামলাবার চেষ্টা করে ওকে। ক'দিন পরে ওই সম্বুদ্ধই কাছা পরে তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে পরাগকে বলে, বেস্পতিবার মা'র কাজ। বাবা বললেন—। কথা শেষ করেনি। তরকারি কোটা থামিয়ে স্তব্ধ চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল শর্মিষ্ঠা। এর পরেই শোনে এবং দ্যাখে, মিস্টার ব্যানার্জির মা এসে থাকছেন ওদের সঙ্গে। তিন মাস আগে ছোট ছেলের কাছে চলে যাবার খবরটা এখনই শুনল।

মনে মনে হিসেব করে শর্মিষ্ঠা দেখল, সেরকম কিছু হলে টের পাবার পক্ষে তিন মাসই যথেষ্ট। তার সন্দেহ ভুল হবার নয়। তার পরেই ভাবল, বস্তির মেয়ে, যার তার সঙ্গে শুতে পারে। এর সঙ্গে পবিত্র ব্যানার্জির সম্পর্ক কী! বড় চাকুরে, হ্যান্ডসাম, গাড়িটাড়ি আছে, ইচ্ছে করলে যে-কোনো ভদ্রলোকের মেয়েকেই টানতে পারেন। নয়নকে কেন!

'যত সব বাজে কথা।' সামান্য বিরক্তি মিশিয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, 'কেয়াদি বুঝি এসব গল্প করে!'

'করে না আবার!' বন্দনা হেসেই বলল, 'কী বলছিল জান তো, পঁয়তাল্লিশের পর পুরুষদের খাঁই বেড়ে যায়। তখন নাকি বাছবিচার থাকে না।'

'এর পর এই কথাটাই রটবে। ছিঃ!'

'তুমি রাগ করছ?' নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বন্দনা বলল, 'এসব মিথ্যে হলেও গুজব একবার ছড়ালে কে বন্ধ করবে! কেয়াদিই বলছিল, অঞ্জনার ঝি মঙ্গলা নাকি বলেছে নয়নের মিস্টার ব্যানার্জির ওখানে কাজ করা নিয়ে হাসাহাসি হয়েছে—'

'অঞ্জনা বলেছে?'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলেছে। না হলে কথাটা উঠল কেন!'

শর্মিষ্ঠা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

এখন সিরিয়াস লাগছে বন্দনাকে। চায়ের খালি কাপদুটো নিয়ে উঠে গেল। আবার ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, 'যা-ই বলো ভাই, একা পুরুষের ফ্ল্যাটে ওই বয়সের একটা আনম্যারেড মেয়ের কাজ করা ঠিক নয়। বস্তির মেয়ে, ওদের কোনো চরিত্র আছে নাকি! বানিয়ে বলে ব্ল্যাকমেলও তো করতে পারে—'

বন্দনার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল শর্মিষ্ঠা। কাজকর্ম পড়ে আছে, এখন তার চলে যাবার সময়। তবু দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে আরও কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকল সে। তারপর উঠতে উঠতে প্রশ্ন করল, 'ছাড়িয়ে দেবে?'

'দেখি।' দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল বন্দনা, 'মঙ্গলা ওই বস্তিতেই থাকে। কালও না এলে ওকে বলব খবর নিতে। ছাড়াতে হলে মেয়েটার মাকে ডেকে এনে একটা কিছু বুঝিয়ে বললেই হবে। না হয় বলব, তুমি নিজে কাজ করো বাপু। মেয়েটাকে সরাও।'

শর্মিষ্ঠাকে দেখে মনে হল না বন্দনার কথায় যুক্তি পাচ্ছে। কিছু ভেবে আচমকা গলায় বলল, 'আমরা ছাড়ালেও পবিত্র ব্যানার্জি ছাড়াবে কেন! তা হলে তো ওঁর সঙ্গেও কথা বলা দরকার।'

'রাখো তো! ওঁর ব্যাপার উনিই বুঝবেন। আমরা তো সেফ থাকি।'

শর্মিষ্ঠা ফিরে এল এবং এর পর থেকেই স্বভাববিরুদ্ধ গম্ভীর হয়ে গেল। সংসারের দায়িত্ব তার। এর আগেও কখনো কখনো দিনের পর দিন কাজের লোক থাকেনি, তখন নিজেই সামলেছে সব কিছু। হাসিমুখে। আজও সে সবই করল। কিন্তু যান্ত্রিকতা এড়াতে পারল না।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পরাগ বলল, 'একদিন কাজের লোক কামাই করলে এত আপসেট হবার কী আছে!'

'আপসেট হয়েছি কে বলল!'

'না বললেও বুঝতে পারা যায়। মনের ছাপ মুখেও পড়ে।'

'গোয়েন্দাগিরি ছাড়ো।' শর্মিষ্ঠার গলায় ঝাঁঝ ফুটল, 'সব সময় তোমাদের মন বুঝে চলতে হবে না কি!'

পরাগ রহস্যেই থেকে গেল।

পরের দিন এবং তার পরের দিনও কাজে এল না নয়ন। কোনো খবরও পাঠাল না। মঙ্গলাকে দিয়ে বন্দনা ওর মায়ের কাছে খোঁজ নিয়েছে কি না জানা যাচ্ছে না সেটাও। শর্মিষ্ঠা একবার ভাবল, যায় জিজ্ঞেস করে। কিন্তু, সন্দেহ দৃঢ়তর হওয়ায় টের পেল কেমন একটা বাধা আসছে ভিতর থেকে। সামান্য ভয়ও। তখন ভাবল, কোনো খবর থাকলে বন্দনা নিজেই কি জানাত না!

দুপুরে গম্ভীর মুখে স্কুলবাস থেকে রন্টুকে ফিরিয়ে আনতে গেল সে। পেট্রল পাম্পের সামনে অঞ্জনা ব্যানার্জির ঝি মঙ্গলাকে দেখেও জিজ্ঞেস করল না কিছু। বিল্ডিংয়ে পৌঁছে ঝি-দের জটলায় চোখ পড়ার ভয়ে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় অনাবশ্যক গল্পে মেতে উঠল রন্টুর সঙ্গে।

তিন দিন নিজেকে আড়াল করে রাখার পর সেদিন সন্ধেয় পরাগ বাড়ি ফিরে এলে নিজেকে আর চেপে রাখতে পারল না শর্মিষ্ঠা। বন্দনার সঙ্গে কথোপকথনের পুরোটাই বর্ণনা করল স্বামীর কাছে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। সুতরাং বিরক্তি ও বিচলিত হবার পক্ষে যথেষ্ট। খানিক

চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে পরাগ বলল, 'এসব কুৎসিত গুজবে তোমার কান দেবার দরকার কি! তোমাদের মিসেস দাশগুপ্ত, কেয়াদি না কে, এদেরও কি খেয়েদেয়ে কাজ নেই! ঝি-চাকরদের সঙ্গে তফাতটা কোথায় বুঝতে পারছি না!'

পরাগের কথার ধরনে দমে গেল শর্মিষ্ঠা। তারপর ভীত গলায় বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না আমি কী বলছি!'

'কী বলছ!'

শর্মিষ্ঠার চোখেমুখে অশান্তি স্পষ্ট। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়া নিজেকে কোনোরকমে একত্র করে সে বলল, 'জুন মাসে রন্টুকে নিয়ে আমি সাত দিন মা'র কাছে গিয়ে ছিলাম। তুমি তখন ফ্ল্যাটে একা ছিলে। নয়ন তখনো আসত!'

'তার মানে! তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ নাকি!'

'সন্দেহ নয়। ভয় পাচ্ছি।' অদ্ভুত চাপা স্বরে শর্মিষ্ঠা বলল, 'সকলেই সব খবর রাখে। যদি তোমার নামেও কিছু রটায়!'

পরাগ চুপসে গেল। কথাগুলোর অর্থ বুঝতে বুঝতে চোখ ফিরিয়ে নিল স্ত্রীর মুখের ওপর থেকে। কিছু একটা নড়াচড়া করছে শরীরের ভিতরে, কী তা অনুভব করা যাচ্ছে না ঠিক। তবে স্পষ্টই অনুভব করল, দবদব করছে মাথা; মেঝে সরে যেতে চাইছে পায়ের তলা থেকে।

এর পর দু দিন স্বামী স্ত্রী পরস্পর মুখ ফিরিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকল।

তৃতীয় দিন সকালে যথানিয়মে যান্ত্রিক হয়ে সংসারের কাজ শুরু করেছিল শর্মিষ্ঠা। রন্টুর ছুটি। অফিসে বেরুবে বলে বাথরুমে ঢুকেছে পরাগ। এই সময় বেল বেজে উঠল ফ্ল্যাটের দরজায়।

কিছু আশা এবং অনেকটা আশঙ্কা নিয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ব্যস্তভাবে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল শর্মিষ্ঠা।

বন্দনা। একা নয়। সঙ্গে নয়নের মা-কেও ধরে এনেছে।

'শোনো কী হয়েছে!'

'কী হয়েছে।'

'কী বলব, মা! মেয়েটার সব্বোনাশ হয়ে গেছে গো!' বলতে বলতে চাপা কান্নায় অস্পষ্ট হয়ে উঠল নয়নের মা, 'মেয়েটার পেটে মস্ত আব হয়েছে গো। জ্বলে মরছে ব্যথায়। শুধু বমি করছে। ডাক্তারবাবু বলল অপারেশন না করলি বাঁচবেনি। চিকিচ্ছের টাকা কোথায়, মা! তোমরা বাঁচাও মেয়েটাকে—'

শর্মিষ্ঠা দুঃখিত হবে কি না বুঝতে পারল না। বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকেও দেখল। একটা পাথর যেন নেমে যাচ্ছে বুক থেকে, অনুভব করল, সেই জায়গাটা ক্রমশ ভরে উঠছে স্বচ্ছ হাসিতে।

বন্দনা বলল, 'আমি এখন একশো দিয়েছি। তুমিও কিছু দাও। কর্তার বন্ধু সেবা প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার, বেড পাওয়া যায় কি না দেখছে। মিস্টার ব্যানার্জির কাছেও পাঠাব একে।'

ক'মুহূর্ত বন্দনা ও নয়নের মা'র দিকে তাকিয়ে থেকে হরিণীর ছন্দে ঘরে এসে শর্মিষ্ঠা দেখল, বাথরুম থেকে বেরিয়ে তৈরি হচ্ছে পরাগ। সেইরকমই গম্ভীর।

তখন তিন দিনের নীরবতা ভেঙে সহাস্য হয়ে শর্মিষ্ঠা বলল, 'অ্যাই, শীগগীরি একশোটা টাকা দাও তো!'

'কী ব্যাপার!'

'নয়নের মা এসে কান্নাকাটি করছে। ওসব কিছু নয়। মেয়েটার পেটে অ্যাবসেস না কী হয়েছে। ইমিডিয়েট অপারেশন দরকার।'

স্ত্রীকে হাসতে দেখে গাম্ভীর্যের মধ্যেও কুণ্ঠিত হাসি ফুটল পরাগের ঠোঁটে। আণ্ডারওয়্যার পরা অবস্থাতেই এগিয়ে গিয়ে বেঁটে আলমারির মাথা থেকে ওয়ালেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'একশো কেন! দুশোই দাও। আফটার অল, গরিব মানুষ!'